কেন শ্রীবিলাসকে চাই

রামানুজ মুখোপাধ্যায়

১৯১৪-র নভেম্বর থেকে ১৯১৫-র মার্চের মধ্যে *সবুজ পত্র* পত্রিকার চারটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল নাতিদীর্ঘ চারটি আখ্যান—অগ্রহায়ণে *জ্যাঠামশায়*, পৌষে *শচীশ*, মাঘে আর ফাল্গুনে *দামিনী* আর *শ্রীবিলাস*। সদ্যরচিত এই আখ্যানগুলির লেখকের নাম রবীন্দ্রনাথ। ১৯১৪-র মে মাসে *সবুজ পত্র* পত্রিকাটি যাত্রা শুরু করেছিল। সেখানে বৈশাখ থেকে কার্তিক পর্যন্ত সাত মাসে প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সাতটি ছোটোগল্প। *হালদার গোষ্ঠী*, *হৈমন্তী*, *বোষ্টমী*, *স্ত্রীর পত্র*-র মতো বহুচর্চিত গল্পগুলি ছিল সেই তালিকায়। আত্মকথনরীতির অকল্পিতপূর্ব উন্মোচন গল্পগুলিকে একসূত্রে গেঁথেছিল। ঠিক যেন ওই সাতটি গল্পের হাত ধরেই অষ্টম সংখ্যায় আত্মপ্রকাশ করেছিল *জ্যাঠামশায়*। সে-সংখ্যার শুরুতে, ৫২৩ থেকে ৫৫০ পৃষ্ঠায় টানা মুদ্রিত হয়েছিল জগমোহনের আখ্যান। পত্রিকার কোথাও কোনও সূচিপত্র ছিল না, এমনকি ছিল না এ-আখ্যান ছোটোগল্প না উপন্যাস তার উল্লেখটুকু পর্যন্ত। *জ্যাঠামশায়* অংশটি পড়ে যাঁরা একে আর-একটি সুখপাঠ্য রবীন্দ্র-ছোটোগল্প বলে ভ্রান্তিপাশে পড়েছিলেন, তাঁদের কার্তিকের সে-ভুল পৌষেই ভেঙে গিয়েছিল *শচীশ* অংশটি পড়ে। মাঘে আর ফাল্গুনে দামিনীর আর শ্রীবিলাসের কাহিনি পড়ার পরে পাঠকের মনে কোনও সংশয় ছিল না যে, এ-আখ্যান একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। চারটি অংশ মিলেই এর পূর্ণতা। ১৯১৬-য় *চতুরঙ্গ* প্রকাশিত হয়েছিল গ্রন্থাকারে।

এ-উপন্যাসের কথক শ্রীবিলাস। কাহিনির যতটুকু যেভাবে শ্রীবিলাস লিপিবদ্ধ করেছে, আমরা ততটুকুই জানতে পেরেছি। সে আখ্যান বলছে না, লিখছে। কথনের অসংলগ্নতা লিখনে অনেকখানি সংহত হয়ে আসে। লিখন সংশোধনকে স্বাগত জানায়, কথনের তাৎক্ষণিকতা তাকে স্পর্শ করে না। ঘটে-যাওয়া ঘটনা তৎক্ষণাৎ কথিত হলে তার মধ্যে থাকে মুহূর্তের মাধুর্য, এমনকি মুহূর্তের দুর্বলতাও। আর ঘটনা ঘটে-যাওয়ার পরে ওই ঘটনারই কোনও চরিত্র যখন তার আখ্যান লিখতে শুরু করে, তখন লিখনের মধ্যে থাকে সময়ের দূরত্ব। ঘটনার সময় তার লিখনের সময়ের মধ্যে যে ব্যবধান, সেই ব্যবধান কথককে পৌঁছে দেয় নিরাপদ দূরত্বে। কাহিনির মধ্যে তখন প্রস্ফুটিত হয় চিন্তনের স্থির সাক্ষ্য। আসলে শ্রীবিলাস এ-উপন্যাসের কথক শুধু নয়, লেখকও। তাই, উপন্যাসের লেখক রবীন্দ্রনাথ আখ্যানের লেখক শ্রীবিলাসের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে পারেন ঔপন্যাসিক অভিনিবেশ।

আখ্যানের অন্দরমহলে প্রবেশ করতে হলে পাঠককে প্রথমেই চিনে নিতে হয় সময়ের

মাত্রাগুলিকে। আখ্যানের রচনাকাল, প্রকাশকাল আর তার ভিতরকার ঘটনার সময়কাল সেই মাত্রাগুলিকে সূচিত করে। *চতুরঙ্গ* উপন্যাসের রচনাকাল আর পত্রিকায় প্রকাশকাল একেবারে পিঠোপিঠি। এর পত্রিকা-প্রকাশ আর গ্রন্থ-প্রকাশের মধ্যেও বিশেষ দূরত্ব নেই। তাহলে এর কাহিনির সময়কালকে বুঝে নিতে পারলেই সহজ হয়ে যায় উপন্যাসের ভিতরঘরে পাঠকের প্রবেশের পথ। এ-উপন্যাসের কাহিনিক্রম যে উনিশ শতকের শেষ লগ্নের, তা বুঝে নিতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। এ-কাহিনির নির্দিষ্ট সময়কাল নির্ণয়ের প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রয়াস লক্ষ করা গিয়েছিল বিমানবিহারী মজুমদারের গ্রন্থে। বিমানবিহারী জানিয়েছিল : "...the real story starts in 1901 when Srivilas discovers Sachish in the company of a Vaisnava Sannyasi, named Lilananda Swami in a remote village in the district of Chittagong'।[১] একইসঙ্গে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন : '... the story comes to an end at the beginning of the year 1904, though it is actually written a little more than a decade afterwards'।[২] শুধু একটিমাত্র ঘটনার কালনির্ণয়ে তিনি কিছুটা ভুল পথে চালিত হয়েছিলেন। ১৮৯৯-এর মার্চে কলকাতায় মারণব্যাধি প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল, এ-কথা উল্লেখ করে তিনি সেই দিনগুলিকে মেলাতে চেয়েছিলেন জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর সঙ্গে।[৩] ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত ছুঁয়ে এই মারণব্যাধি ১৮৯৮-এর গোড়ায় হানা দিয়েছিল কলকাতায়। অসহায়ভাবে মারা গিয়েছিল বহু মানুষ, প্রাণভয়ে কেউ কেউ পালিয়েছিল শহর ছেড়ে গ্রামে। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দেই সহজ বাংলায় 'প্লেগ' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন সুখ্যাত চিকিৎসক রাধাগোবিন্দ কর।[৪] এখান থেকে জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুকালকে মিলিয়ে নিতে আমাদের কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। পরবর্তীকালে তথ্যের অনুপুঙ্খ বিস্তারে তপোব্রত ঘোষ দেখিয়েছিলেন, শ্রীবিলাস ডায়ারি লিখতে শুরু করেছিল ১৮৯২-৯৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে, আর তার ডায়ারি লেখা শেষ হয়েছিল ১৯০৪-এর বসন্তে।[৫]

১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে শ্রীবিলাস পাড়াগাঁ থেকে কলকাতায় এসে শুরু করেছিলন কলেজের পড়াশুনো।[৬] বিএ ক্লাশের ছাত্র, প্রায় সমবয়সী শচীশকে তার ভালো লেগে গিয়েছিল। শচীশ মল্লিক তার পুরো নাম। শ্রীবিলাসের লিখনেও আছে সেই প্রথম ভালোলাগার মাধুর্যের প্রকাশ :

> শচীশকে দেখিলে মনে হয় যেন একটি জ্যোতিষ্ক—তার চোখ জ্বলিতেছে; তার লম্বা সরু আঙুলগুলি যেন আগুনের শিখা; তার গায়ের রঙ যেন রঙ নহে, তাহা আভা। শচীশকে যখন দেখিলাম তখনি যেন তার অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাইলাম; তাই একমুহূর্তে তাহাকে ভালোবাসিলাম।

বন্ধুর প্রতি শ্রীবিলাসের এই ভালোবাসা খুব সহজেই ভক্তিতে পৌঁছেছে। সে জানিয়েছে, 'আমি শচীশকে মনে মনে ভক্তি করি।' কলেজে অধ্যাপক উইলকিনস সাহেবের ইংরিজি সাহিত্যের ক্লাশে শচীশের বিদ্যেবুদ্ধির খ্যাতি যেমন তাকে মুগ্ধ করেছিল, তেমনি শচীশের দ্যুতিময় ব্যক্তিত্বও তাকে কম আকর্ষণ করেনি। শচীশ সোনার বেনে। সে নাস্তিক। এই দুই

নিষ্ঠুর সত্য শ্রীবিলাসকে আহত করেছিল মনে-মনে। শ্রীবিলাস নিষ্ঠাবান কায়স্থ ঘরের ছেলে। তারা শৈশব থেকে জাতি হিসেবে সোনার বেনেকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতে শিখেছে। তারা নাস্তিককে নরখাদকের চেয়ে, এমনকি গো-খাদকের চেয়েও পাপিষ্ঠ বলে জানে। এই অপ্রিয় সত্য যাচিয়ে নেওয়ার পরেও শচীশের প্রতি শ্রীবিলাসের আকর্ষণ দিকভ্রষ্ট হয়নি। সে ক্রমশ উপলব্ধি করতে পেরেছে, বিদেশি সাহিত্য আর যুক্তিশাস্ত্র সম্পর্কে শচীশের সুচারু চিন্তনের নেপথ্যে আছে তার জ্যাঠামশায়ের প্রণোদনা। শচীশের প্রতি তীব্র আকর্ষণ শ্রীবিলাসকে পৌঁছে দিয়েছিল জ্যাঠামশায়ের দোরগোড়ায়। জগমোহন মল্লিক শচীশের জ্যাঠামশায়। আস্তিক্যধর্মে তাঁর কোনও আস্থা ছিল না। শ্রীবিলাস জানিয়েছে : 'তিনি তখনকার কালের নামজাদা নাস্তিক।' আমরা জানি, উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের সূচনালগ্নে এ-আখ্যানের সময়কাল। 'তখনকার কালের' বলতে নিশ্চয় বোঝানো হয়েছে সেই সময়কেই। শচীশের নাস্তিকতার দীক্ষা জ্যাঠামশায়ের কাছে। অধ্যাপক উইলকিনস সাহেবের সঙ্গে ইংরিজি বইপত্তর নিয়ে পজিটিভিজম-চর্চায় শচীশের যে এত আগ্রহ, তার কেন্দ্রেও ছিল জ্যাঠামশায়েরই দীক্ষা।

১৯১৪-র হেমন্ত থেকে ১৯১৫-র বসন্ত পর্যন্ত উপন্যাসটি আত্মপ্রকাশ করেছিল পত্রিকার পাতায়। বিপিনবিহারী গুপ্তের *পুরাতন প্রসঙ্গ* বইটি প্রকাশিত হয়েছিল তার কয়েক বছর আগেই, ১৯১৩-র বর্ষায়। সে-বইয়ে সংকলিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের স্মৃতিকথায় ছিল বাঙালি নাস্তিক পজিটিভিস্টদের জীবনকথা। অবশ্য গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগেই স্মৃতিকথাগুলি মুদ্রিত হয়েছিল *আর্যাবর্ত* পত্রিকায়। লেখাগুলি পত্রিকার পাতায় পড়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই সময় *প্রবাসী* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত *জীবনস্মৃতি*-র পাতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন বেন্থাম-মিল-কোঁতের প্রভাবে নাস্তিকতার-নেশায়-পাওয়া তার্কিক বাঙালি যুবকদের কথা। আরও আগে, ১২৯২ বঙ্গাব্দের *ভারতী* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল 'পজিটিবিজম এবং আধ্যাত্মিক ধর্ম' নামে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দীর্ঘ প্রবন্ধ।[৭] বাংলাদেশে ধ্রুববাদ-চর্চার স্রোত প্রবেশ করেছিল ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলেও। প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের মননশীল মানুষের চিন্তনে ধ্রুববাদের অস্তিত্ব অনেক আগেই লক্ষ করা গিয়েছিল, ইতিহাসে তার সাক্ষ্য আছে।[৮] কিন্তু, উনিশ শতকের ফরাসি দার্শনিক ওগুস্ত কোঁত (১৭৯৮-১৮৫৭ খ্রি.)-এর আবির্ভাবের আগে ধ্রুববাদকেও কোনও বিশিষ্ট দর্শন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি। ধ্রুববাদের চর্চায় কোঁতের নামটি তাই ওতপ্রোত লগ্ন হয়ে আছে। কোঁত শুধুমাত্র একজন দার্শনিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন নতুন এক ধর্মশাস্ত্রের প্রবক্তাও।[৯] বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২ খ্রি.) ছিলেন অষ্টাদশ শতকের আইনতত্ত্ববিদ ও চিন্তানায়ক। বেন্থামের মতবাদের অভিনব ভাষ্য রচনা করেছিলেন মিল (১৮০৬-১৮৭৩ খ্রি.)। *ইউটিলিটারিয়ানিজম* নামে তাঁর বিখ্যাত সন্দর্ভটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (১৮৪০-১৯৩২ খ্রি.) ছিলেন উনিশ শতকের প্রথম বিশিষ্ট বাঙালি পজিটিভিস্ট। এ-সময়ের সুপরিচিত তিন বাঙালি ধ্রুববাদী দার্শনিক ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮২৯-১৮৬৯ খ্রি.), গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় (১৮১৪-১৮৮২ খ্রি.) আর দ্বারকানাথ মিত্র

(১৮৩৩-১৮৭৪ খ্রি.)। যে-তিনজন বিখ্যাত বিদেশি পজিটিভিস্ট মিশনারি উনিশ শতকে বাংলাদেশে ধ্রুবদর্শনের চর্চাকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছিলেন, তাঁরা হলেন স্যামুয়েল লব (১৮৩৩-১৮৭৬ খ্রি.), জেমস গেডেস (?) এবং হেনরি কটন (১৮৪৫-১৯১৫ খ্রি.)।[১০] এঁদের মধ্যে স্যামুয়েল লবই এ-প্রসঙ্গে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। কেমব্রিজের একটি কলেজে পড়াশুনো শেষ করে ভারতবর্ষে এসে তিনি ১৮৬৩-তে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। অন্তত বছর সাতেক তিনি সেখানেই অধ্যাপনায় রত ছিলেন। একসময় অসুস্থ শরীর নিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন স্বদেশে। সেখান থেকে আবার এ-দেশে এসে কয়েক বছর পরই তিনি যোগ দিয়েছিলেন কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজে, অধ্যক্ষের আসনে। ১৮৬৭-র পর থেকে সে-কালের বিখ্যাত ইংরিজি কাগজগুলিতে, বিশেষত *ক্যালকাটা রিভিউ* (১৮৬৮-১৮৭১ খ্রি.) এবং *দ্য বেঙ্গলি* (১৮৬৭-১৮৭১ খ্রি.) পত্রিকায়, ধ্রুবদর্শন বিষয়ে নিয়মিত লেখালিখি করেছিলন স্যামুয়েল লব। এ-বিষয়ে তাঁর সুখ্যাত বইগুলিও আত্মপ্রকাশ করেছিল কাছাকাছি সময়েই।[১১] বিশেষত, ১৮৭৩-এ প্রকাশিত লবের *এ ব্রিফ ভিউ অফ পজিটিভিজম ইন ইন্ডিয়া* বইটির কথা নিশ্চয় আমাদের মনে থাকবে। *দ্য বেঙ্গলি* পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ধ্রুববাদ বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের আগ্রহ স্যামুয়েল লবকে মুগ্ধ করেছিলেন। বাংলাদেশে ধ্রুববাদ-চর্চার সূত্রপাত ঘটেছিল ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত এইচ সি মুখার্জির *লেকচারস অন রিলিজিয়াস সাবজেক্টস* বইটিতে।[১২] সে-চর্চা আরও বিস্তৃত, আরও নিবিড় হতে শুরু করেছিল উনিশ শতকের ষাটের দশকে, মূলত স্যামুয়েল লবের লেখালিখির সূত্রেই। প্রেসিডেন্সি কলেজ ছিল সে-কালের তরুণ তার্কিক বাঙালি পজিটিভিস্ট ছাত্রদের প্রধান চারণভূমি। শচীশ আর শ্রীবিলাস যে প্রেসিডেন্সি কলেজেরই ছাত্র ছিল, সে-নিয়ে সংশয়ের কোনও অবকাশ নেই। 'গোলদিঘির ছায়ায়' তাদের আলাপ তার সাক্ষ্য বহন করেছে। এমনকি, অধ্যাপক উইলকিনসের মধ্যেও পাওয়া যাবে প্রখ্যাত পজিটিভিস্ট অধ্যাপক স্যামুয়েল লবের ছায়া।

জ্যাঠামশায়ের নাস্তিকতার একটি প্রধান লক্ষণ ছিল 'লোকের ভালো করা'। লোকহিতের একটি বাণীও তাঁর ছিল। পত্রিকাপাঠে আর গ্রন্থপাঠে তার দু-রকম রূপ আমরা পেয়েছি। পত্রিকাপাঠে যা ছিল 'অধিকতম লোকের প্রভূততম সুখসাধন', গ্রন্থপাঠে তা-ই হয়েছে 'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধন।' জ্যাঠামশায়ের এই বাণী বেন্থামের উপযোগবাদের প্রতিধ্বনিমাত্র।[১৩] জ্যাঠামশায়ের সান্নিধ্য থেকে শচীশের মাথার মধ্যে ঘটে গিয়েছিল 'মিল-বেন্থামের অগ্নিকাণ্ড'। ইংরেজ অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিক ম্যালথসের (১৭৭৬-১৮৩৪ খ্রি.) জনসংখ্যাতত্ত্বের সঙ্গে হিতবাদের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড়। জনসংখ্যা যে-হারে বেড়ে চলে, খাদ্য উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পায় তার থেকে অনেক বিলম্বিত লয়ে। তাই বিশ্বের সর্বত্র খাদ্যের চাহিদার তুলনায় জোগান থাকে স্বল্প। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে যদি ঠেকানো না-যায়, তাহলে তো প্রচুর মানুষের প্রভূত হিতসাধনের ব্রত ব্যাহত হবে। ধাক্কা খাবে হিতবাদের তত্ত্ব। মূলত সেখান থেকে ম্যালথস তাঁর ভাবনা শুরু করেছিলেন। প্রথমে তিনি

মনে করেছিলেন, প্রকৃতিই জনসংখ্যার ভারসাম্য রক্ষা করে দুর্ভিক্ষ-মহামারির, খরা-বন্যার, দাঙ্গা-যুদ্ধের ছলে। কিন্তু পরে ম্যালথস আস্থা রেখেছিলেন মানুষের নৈতিক সংযমের উপরে। তিনি মনে করেছিলেন, কৌমার্য-বরণ, বিলম্বিত-বিবাহ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হতে পারে। যৌবনে জগমোহনের স্ত্রী মারা যান, তার আগে তিনি ম্যালথস পড়েছিলেন, আর বিয়ে করেননি। তাঁর এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে আছে হিতবাদের ছায়া। ধ্রুবদর্শন আর হিতবাদ হাত ধরাধরি করে চলেছিল জ্যাঠামশায়ের জীবনে।[১৪]

জ্যাঠামশায়ের পারিবারিক জীবন বলে কি কিছু ছিল? তিনি স্ত্রীপুত্রহীন, আত্মীয়-পরিজন থেকে দূরে থাকা, একা মানুষ। পড়াশুনোর জগতেই তাঁর বসবাস। শ্রীবিলাস জানিয়েছে :

> ইংরেজি-ভাষায় অসামান্য ওস্তাদ বলিয়া জগমোহনের খ্যাতি। কাহারও মতে তিনি বাংলার মেকলে, কাহারও মতে বাংলার জনসন। শামুকের খোলার মতো তিনি যেন ইংরেজি বই দিয়া ঘেরা।

ছোটোবেলা থেকে এই জ্যাঠামশায়ের সান্নিধ্যে শচীশ বেড়ে উঠেছে। তার পড়াশুনোর দীক্ষাও জ্যাঠামশায়ের কাছে। যা সচরাচর লোকে চাপা দিয়ে থাকে, এমন বিষয়ও জগমোহন অকুণ্ঠচিত্তে আলোচনা করতেন শচীশের সঙ্গে। প্রণামে নয়, ভ্রাতুষ্পুত্রের আলিঙ্গনেই স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন তিনি। শচীশের মনকে তো সংস্কারহীন, হিতবাদ আর ভক্তিবাদের অনুকূল করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। জ্যাঠামশায়ের দীক্ষা শেষপর্যন্ত কোথায় পৌঁছে দিয়েছিল শচীশকে? বিধবা ননিবালা তার বিধবা মায়ের সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল নিজের মামারবাড়িতে। সেখানে মায়ের মৃত্যুর পর অল্প দিনের মধ্যে তার সামনে ঘনিয়ে উঠেছিল বিপদ। মামাতোভাইগুলি ছিল দুশ্চরিত্র। তাদের এক বন্ধু ননিবালাকে মামারবাড়ির নিষ্ঠুর আশ্রয় থেকে মুক্ত করে এনেছিল। কিন্তু, কিছু দিনের মধ্যে সন্দেহে আর ঈর্ষায় ননিবালাকে অসহ্য অপমান করেছিল সেই বন্ধুটি। সে-বন্ধু আর কেউ নয়, শচীশের দাদা পুরন্দর। শচীশ যেখানে শিক্ষকতা করত, তার পাশের বাড়িতেই ঘটেছিল এ-ঘটনা। ননিবালা সন্তানসম্ভবা ছিল। শচীশ চেয়েছিল ননিবালাকে উদ্ধার করতে। তার তো না-আছে অর্থ, না-আছে ঘরদুয়োর, তাই সে এসেছিল জ্যাঠামশায়ের কাছে। প্রিয় বইগুলিকে শোবার ঘরে রেখে, জগমোহন তার লাইব্রেরি-ঘরে ননিবালাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তিনি ননিবালাকে 'মা' বলে ডাকতেন। জ্যাঠামশায়ের সযত্ন স্নেহের পরশে কি আমূল বদলে গিয়েছিল তার দিনগুলি? ননিবালার উপস্থিতিতে ঋজু চরিত্রের যুক্তিবাদী জ্যাঠামশায়ের অন্য রূপ আমরা দেখতে পেয়েছিলাম উপন্যাসে। ম্যলথস পড়ে যে-বিপত্নীক জগমোহন পুনর্বিবাহ করেননি, তিনিই ননিবালাকে ডেকেছিলেন মাতৃসম্বোধনে। বৃদ্ধা দিদিমার বিদ্রুপের সামনে ননিবালার তথাকথিত 'কলঙ্কিত' মাতৃত্বের পক্ষে দাঁড়িয়ে জগমোহন বলতে পেরেছিলেন, 'জীবনকে যিনি ধারণ করেন', যিনি নিজের প্রাণসংশয়কে উপেক্ষা করে সন্তানের জন্ম দেন, তিনিই মা। জ্যাঠামশায় জানতেন না, ননিবালাকে কে 'নষ্ট' করেছে। শচীশ জানত, ননিবালা যে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছে বা করতে বাধ্য

হয়েছে, পুরন্দরই সেই সন্তানের জন্মদাতা। বাবা হরিমোহন আর দাদা পুরন্দর যে অন্যায় উপদ্রব করে চলেছিল, ননিবালাকে 'নষ্ট' করাটাও কি তারই অঙ্গ বলে ধরে নিয়েছিল শচীশ? সে কি সিভিল আইনে ননিবালাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল পারিবারিক পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার তাগিদেই? পুরন্দর যে ননিবালাকে 'নষ্ট' করেছে, সে-তথ্য নিশ্চিত জানার পরেও শচীশ সে-কথা জ্যাঠামশায়ের কাছে চেপে গিয়েছিল। জানতে পারলে জগমোহন রেগে গিয়ে গোলমাল বাঁধাতে পারেন, শুধু কি এই ভয়ে শচীশ এত বড়ো নিষ্ঠুর সত্যকে চাপা দিতে চেয়েছিল? এখানে কোথাও নিজস্ব পারিবারিক দায়বোধও কি কাজ করেছিল শচীশের মধ্যে? সে তো নিজেই বলেছিল, 'আমি ননিকে বিবাহ করিব।' নিশ্চয় জ্যাঠামশায়ের কাছে পাওয়া মানুষের হিতসাধন করার প্রচেষ্টা তার মধ্যে কাজ করেছে। শ্রীবিলাস জানিয়েছেন :

> শচীশ এতদিন ননিকে এড়াইয়া চলিত; একলা তো একদিনও দেখা হয় নাই, তার সঙ্গে - দুটো কথা হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

এখানে 'এতদিন' বলতে এই বিয়ের কথা ওঠার আগে পর্যন্ত সময়কে বোঝানো হয়েছে। তাহলে, ব্যক্তি ননিবালার প্রতি কোনও আগ্রহে বা ভালোবাসায় শচীশ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। সে জানিয়েছিল, 'কুলের কলঙ্ক মুছিবার জন্যেই আমার এই প্রচেষ্টা, নহিলে বিবাহ করিবার শখ আমার নাই।' তার মনের মধ্যে কোনও ব্যক্তিগত ভালোবাসা, দায়বোধ তৈরি হয়নি। তার যাবতীয় আনুগত্য ছিল আদর্শের কাছে। শচীশ বারবার আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে তত্ত্বকে, জীবনকে নয়। ননিবালার প্রতি স্নেহ ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত হয়েছিল জ্যাঠামশায়ের মনে, সেখানে কোথাও কোনও তত্ত্বের দাসত্ব ছিল না, ছিল আন্তরিকতার ছোঁয়া। জ্যাঠামশায় এত চেষ্টা করেও ননিবালাকে বুঝতে পারেননি, শচীশও পারেনি। কিন্তু এই দুই না-পারার মধ্যে আছে মাত্রাগত প্রভেদ। বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে ননিবালা পুরন্দরের সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছে, শচীশ তার কাছে দেবরপ্রতিম। ননিবালা যে জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত, তাতে সামাজিক সংস্কার তার মজ্জাগত। সেখানে শচীশের বিবাহপ্রস্তাব তাকে অপ্রস্তুত করেছে, হয়তো ভিতরে-ভিতরে খানিকটা বিব্রতও করেছে। আমরা জানি না, শচীশের পরিবর্তে অন্য কেউ হলে এ-বিবাহপ্রস্তাবে সম্মত হওয়া ননিবালার পক্ষে সহজ হত কিনা। এক জ্যাঠামশায় ছাড়া, সমগ্র উপন্যাসে কোনও ব্যক্তির প্রতি শচীশের কোনও বন্ধন তৈরি হয়নি—না স্নেহের বন্ধন, না প্রেমের বন্ধন, না বন্ধুত্বের বন্ধন। শ্রীবিলাস আর দামিনীর সঙ্গে শচীশের সম্পর্ককেও মিলিয়ে নেওয়া যাবে তারই সূত্রে।

বাংলাদেশে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল উনিশ শতকের শেষ দশকে। হরিমোহনের পরিবার প্লেগের ভয়ে কলকাতা ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছিল গ্রামে। শচীশ তাদের সঙ্গে যেতে রাজি হয়নি। সে যোগ দিয়েছিল জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে, পাড়ার অসহায় রোগগ্রস্থ চামারদের পাশে। প্লেগে আক্রান্ত অসংখ্য অসহায় মানুষের কথা ভেবে বাড়িতেই প্রাইভেট হাসপাতাল বসিয়েছিলেন জগমোহন। সেবাব্রতে শচীশের সঙ্গে শ্রীবিলাস ছাড়া আরও দু-একজন

ছিল। তাদের দলে একজন ডাক্তারও ছিলেন। প্লেগের সংক্রমণ থেকে জ্যাঠামশায়কে বাঁচানো যায়নি। তাঁর মৃত্যুর পর শচীশ গ্রামে-গ্রামে ঘুরতে শুরু করেছিল, বছর দুয়েক তার আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

শচীশ গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল চট্টগ্রামের কাছে লীলানন্দ স্বামীর কীর্তনের দলে। গ্রামে-গ্রামান্তরে শিষ্যবাড়িতে চলে তাদের নামসংকীর্তনের বিস্তার। লোকারণ্যে পূর্ণ হয়ে ওঠে আঙিনা। নিশিদিন সচল থাকে কীর্তনের রেশ, দূরাগত ভক্তদের জন্যে চলতে থাকে আহারের বন্দোবস্ত। এ-সবে ব্যস্ত থাকে শচীশ। সে লীলানন্দ স্বামীর জন্যে তামাক সেজে দেয়। বেঁচে থাকাকালীন জ্যাঠামশায়ের পাদস্পর্শে করেনি শচীশ। সে জ্যাঠামশায়কে প্রথম ও শেষ প্রণামটি করেছিল তাঁর মৃত্যুর পরে। সেই শচীশ প্রশ্নহীন ভক্তিতে আর নিয়মহীন নিষ্ঠায় লীলানন্দ স্বামীর পদসেবা করেছে। তার মনে হয়েছে :

> জ্যাঠামশায় যখন বাঁচিয়া ছিলেন তখন তিনি আমাকে জীবনের কাজের ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়েছিলেন, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় খেলার আঙিনায়; জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পর তিনি আমাকে মুক্তি দিয়েছেন রসের সমুদ্রে, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় মায়ের কোলে।

এ-সব দেখেশুনে সংশয় জেগেছিল শ্রীবিলাসের মনে। তার মনে হয়েছিল, 'এই তামাক-সাজানো পা-টেপানো এ-সমস্ত উপসর্গ জ্যাঠামশায়ের ছিল না—মুক্তির এ চেহারা নয়।' জগমোহনের মৃত্যুর পরে শ্রীবিলাস দু-বছর কাজ করেছে তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে। বুঝতে অসুবিধে হয় না, সে-কাজ প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম হিতসাধনের ব্রত। 'জ্যাঠামশায়ের চেলা' বলে নিজের পরিচয় দিতে শ্রীবিলাস গর্ব বোধ করেছে। বন্ধুত্বের সূচনায় সে যেমন ভেবে পায়নি, শচীশের মতো মানুষ কেমন করে নাস্তিক হতে পারে, তেমনি বন্ধুত্বের পরিণতিতেও সে লীলানন্দ স্বামীর আশ্রমে গিয়ে কল্পনা করতে পারেনি শচীশ কী করে ভক্ত বৈষ্ণব হয়ে উঠতে পারে। শচীশের এই পরিবর্তন শ্রীবিলাসকে অবাক করেছে। লীলানন্দ স্বামীর কীর্তনের দলে শচীশের উপস্থিতির খবর পেয়ে জ্যাঠামশায়ের অনুগামীরা অনেকেই তার উপরে চটে গিয়েছিল। তারা বলেছিল, এ-কথা তাদের কাছে প্রথম থেকে স্পষ্ট ছিল যে, শচীশের মধ্যে বস্তু কিছু নেই, শুধু ফাঁকা ভাবুকতা। শ্রীবিলাস মন থেকে সে-কথা বিশ্বাস করতে পারেনি। এতদিন যে-শচীশকে সে ভালোবেসেছে, উপলব্ধি করেছে, তার মধ্যে কি ভুল ছিল কোথাও, নাকি দলের লোকেরাই শচীশকে ঠিক চিনতে পারেনি—শ্রীবিলাসের মনে এই সংশয় ক্রমশ আরও ঘনীভূত হয়েছে। লীলানন্দ স্বামীর দলে শচীশকে দেখে শ্রীবিলাস উপলব্ধি করেছিল, 'শচীশ এমন একটা জগতে আছে আমি যেখানে একেবারে নাই।' সে বুঝতে পেরেছিল, মিলনমাত্র যে-শচীশ তাকে আলিঙ্গন করেছিল সে-শ্রীবিলাস কোনও ব্যক্তিবিশেষ নয়, সে 'সর্বভূত', সে একটা আইডিয়া। শ্রীবিলাস জানে, আইডিয়া জিনিসটা মদের মতো, সেখানে ব্যক্তিবিশেষের কোনও মর্যাদা নেই। তবু, শচীশের প্রতি বন্ধুত্বের আবেগমিশ্রিত কৌতূহলের কারণেই শ্রীবিলাস খুব অল্প সময়ের মধ্যে বাঁধা পড়েছিল লীলানন্দ স্বামীর দলে, শচীশের সঙ্গে সে হয়ে উঠেছিল 'প্রধান

শিষ্য'।

দুর্ধর্ষ দুই ইংরিজিওয়ালা নাস্তিককে দলে জুটিয়ে লীলানন্দ স্বামীর বেশ নামের পসার হয়েছিল। কলকাতাবাসী ভক্তরা তাঁকে শহরে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বারবার। আগে কলকাতায় লীলানন্দ স্বামী সদলবলে এসে থাকতেন শিবতোষ নামে এক ভক্তশিষ্যের বাড়িতে। দলবলসহ গুরুর সেবা করাতেই ছিল শিবতোষের আনন্দ। মৃত্যুর আগে অল্পবয়সী নিঃসন্তান স্ত্রী দামিনীকে জীবনসত্ত্ব দিয়ে কলকাতার বাড়ি ও বিষয়সম্পত্তি গুরুর চরণে সমর্পণ করেছিল শিবতোষ। তার ইচ্ছা ছিল, এ-বাড়ি কালক্রমে তাদের সম্প্রদায়ের প্রধান তীর্থস্থল হয়ে উঠুক। শচীশ আর শ্রীবিলাসও সেই বাড়িতে থাকতে শুরু করেছিল লীলানন্দ স্বামীর দলে।

এ-উপন্যাসের আখ্যানে সব চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন শুরু হয়েছিল *শচীশ* অধ্যায়ের ছ-নম্বর অংশ থেকে। সেখানেই শিবতোষের নিঃসন্তান বিধবা স্ত্রীর আবির্ভাব ঘটেছিল। দামিনী তার নাম। তাকে দেখে শ্রীবিলাসের মনে হয়েছিল—'দামিনী যেন শ্রাবণের মেঘের ভিতরকার দামিনী।' তার কণ্ঠস্বর শুনে শ্রীবিলাসের—'হঠাৎ মনে হইত অনাবৃষ্টির মধ্যে যেন ঝরঝর করিয়া এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল।' বাইরে সে 'পুঞ্জ পুঞ্জ যৌবনে পূর্ণ', তার 'অন্তরে চঞ্চল আগুন ঝিকমিক' করে উঠেছে। শচীশ আর শ্রীবিলাস লীলানন্দ স্বামীর সঙ্গে এতটাই একাত্ম হয়ে উঠেছিল যে অল্পদিনেই তাদের সামনে ভেঙে গিয়েছিল দামিনীর আড়াল-আবডাল। শচীশ উপলব্ধি করেছিল, ননিবালা আর দামিনীর মধ্যে নারীর বিপরীত দুই বিশ্বরূপ। ননিবালা মৃত্যুর মধ্যে জীবনের সুধাপাত্রকে পূর্ণ করেছে, আর দামিনী তো মৃত্যুর কেউ নয়, 'সে জীবনরসের রসিক'। সন্ন্যাসীকে সে ঘরে স্থান দিতে রাজি নয়। এইখানে কি কোথাও আমাদের মনে পড়বে জ্যাঠামশায়ের কথা? একজন সন্ন্যাসীকে দেখে একবার জ্যাঠামশায় বলেছিলেন : শোকের ঘা, ক্ষতির ঘা, মুক্তির লোভের ঘা দিয়ে সংসার মানুষকে পোদ্দারের মতো বাজিয়ে নেয়। যাদের সুর দুর্বল, পোদ্দাররূপী সংসার তাদের টান মেরে ফেলে দেয়। বৈরাগীরা সেই ফেলে-দেওয়া মেকি টাকা, জীবনের কারবারে একেবারে অচল। অথচ এরা বেশ গর্ব করে বলে বেড়ায় সংসার ত্যাগ করার কথা। আসলে সংসারই তাদের ত্যাগ করে। শুকনো পাতা গাছ থেকে ঝরে পড়ে গাছ তাকে ঝরিয়ে দেয় বলেই—সে যে আবর্জনা। এ-সবই জ্যাঠামশায়ের কথা। 'জ্যাঠামশায়ের চেলা' শ্রীবিলাস প্রথমবার দেখে বেশ অবাক হয়েছিল, শচীশ লীলানন্দ স্বামীর দলে করতাল বাজিয়ে কীর্তন গেয়ে বেড়াচ্ছে পাড়ায়-পাড়ায়। শচীশও কি তবে ওই আবর্জনার দলেই পড়ল, জীবনের হাটে কি তবে শচীশের কোনও দর নেই—শ্রীবিলাসের মনেও তৈরি হয়েছিল এই সংশয়। কেননা, শ্রীবিলাস নিঃসংশয়ে জানিয়েছিল, 'আমি সন্ন্যাসী নই।' সে বলেছিল, 'সন্ন্যাসী হওয়া আমার ধাতে নেই।' এই শ্রীবিলাস নিশ্চিতভাবে 'জ্যাঠামশায়ের চেলা', কিন্তু এই শচীশ ত্যাগ করে এসেছিল জ্যাঠামশায়ের আদর্শকে।

ননিবালার মৃত্যু জ্যাঠামশায়ের তত্ত্বের প্রতি শচীশকে সন্দিহান করে তুলেছিল। তাই জগমোহনের মৃত্যুর পর সে আশ্রয় নিয়েছিল একেবারে বিপরীত কোটিতে, লীলানন্দের

দলে। নিশ্ছিদ্র যুক্তির বন্ধন ছেড়ে সে ভাসতে চেয়েছিল অবিশ্রাম ভক্তির স্রোতে। নাস্তিকের হিতবাদ থেকে সে পৌঁছতে চেয়েছিল বৈষ্ণবের ভক্তিবাদে। জ্যাঠামশায়ের আদর্শদীক্ষাকে যখন অসম্পূর্ণ মনে হয়েছিল তখন সে গিয়েছিল ধ্রুবদর্শনের জগৎ থেকে বৈষ্ণবীয় লীলার জগতে। জ্যাঠামশায়ের নাস্তিকতা থেকে লীলানন্দ স্বামীর বৈষ্ণবতাতেই কেন যেতে হল তাকে? শচীশ সোনার বেনে। সুবর্ণবণিকরা ঐতিহাসিকভাবে বৈষ্ণব। এখানেও কি শচীশের মধ্যে কোথাও কাজ করে গেছে জাতিগত স্মৃতি?[১৫] 'জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে শচীশের চেহারার আশ্চর্য মিল' জন্মের সময় থেকেই লক্ষ করেছিল প্রায় সকলে। পত্রিকাপাঠে শ্রীবিলাসের লিখনে লীলানন্দ স্বামী সম্পর্কে এই অংশটি পড়ে চমকে উঠতে হয় :

> ইঁহাকে দেখিয়া একটু কেমন জ্যাঠামশায়কে মনে পড়িল। রং তেমন গৌর নয় কিন্তু নাক সেইরকম যেন বাঁকা তলোয়ারের মত; চোখে সেইরকম একটা জোর আছে, যেন তাহা হাতের মত করিয়া ঠেলা দিতে পারে। বিশেষত কথা কহিবার সময়ে তাঁর ডান হাতের ভঙ্গী যে রকম একটা প্রভুত্ব প্রকাশ করে সে ঠিক জ্যাঠামশায়ের মত।[১৬]

প্রথমে শচীশের আর তারপরে শ্রীবিলাসের, লীলানন্দ স্বামীর দলে থেকে যাওয়ার এও কি তবে একটা আকর্ষণ? জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে লীলানন্দ স্বামীর শুধু চেহারার আর বিভঙ্গের আশ্চর্য মিল? প্রবল প্রভুত্বকামী কোনও পিতৃপ্রতিম পুরুষের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে শচীশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিল। জ্যাঠামশায় আর লীলানন্দ স্বামীর মধ্যেও কি সে লক্ষ করেছিল সেই প্রভুত্বেরই প্রকাশ? লীলানন্দ স্বামীর প্রতি তার আকর্ষণের সেও কি তবে একটা বড়ো কারণ? শচীশের ভাবতন্ময়তাকে শ্রীবিলাসের মনে হয়েছিল 'আত্মসম্মোহন'। পত্রিকাপাঠের এই তাৎপর্যপূর্ণ শব্দটিকে রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থপাঠে বর্জন করেছিলেন। শচীশের যাবতীয় আকর্ষণের কেন্দ্রে কি ছিল সেই একই 'আত্মসম্মোহন'? শচীশের আকর্ষণে শ্রীবিলাস গিয়েছিল জ্যাঠামশায়ের কাছে, সেই একই আকর্ষণ তাকে নিয়ে গিয়েছিল লীলানন্দ স্বামীর কাছে।

লীলানন্দ স্বামী রসের মানুষ। তাঁর দলবলের কর্মকাণ্ড যেন এক 'রসের রাজ্য'। সেখানে গুরু আর গুরুভাইয়ের মধ্যে চলে 'রসের ও রসতত্ত্বের আলোচনা'। শুরুতে যাকে 'রসের প্রলয়মোহ' বলে মনে হয়েছিল, পরে তাকেই সে বলেছে 'রসালোচনার ঢেউ'। লীলানন্দ স্বামীর দলে থেকে শ্রীবিলাস অনায়াসেই লিখতে পেরেছিল :

> রস জিনিসটা যে আছে সেই কথাটা আমাদের জীবন হইতে এতদিন একেবারে বাদ পড়িঁয়াছিল। বুঝিবা তার অপঘাতে মৃত্যু ঘটিয়া থাকিবে। আজ সে ভূত হইয়া আপন দেহহীন দৌরাত্ম্যে সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন করিয়া দিল।

শ্রীবিলাস এ-আখ্যানের কথক। 'শচীশ' অধ্যায়ে লীলানন্দ স্বামীর কথা যখন এসেছে, তখন থেকে তার লিখনে এসেছে বৈষ্ণবের ভাব ও ভাষা, 'কীর্তনের রসমাধুর্যে' তারা বিভোর হয়েছে। কখনও শ্রীবিলাসের মনে হয়েছে, দামিনীর চোখের চাওনিটুকু শচীশের মনের মধ্যে 'কীর্তনেরই একটি মূর্তিমান আখরের মতো' বাজতে থাকে, কখনও সে

বলেছে—'শচীশের রসের ঘাটে দামিনী যেন একটা মত্ত নৌকা'। পাণ্ডুলিপির বর্জিতপাঠে সে শচীশ সম্পর্কে লিখেছিল :

> তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলে বাঁশি শুনিয়াছি, আমি কুল ছাড়িয়াছি, তোমরা আমাকে নিন্দাই কর আর যাই কর এখন আমার ঘরের কাজ নাই, এখন আমার অভিসার।[১৭]

আবার দামিনীর সঙ্গে নৃত্যমুখর দাম্পত্যের দিনগুলি অতিবাহিত করতে-করতে তার উপলব্ধি হয়েছিল :

> কলিকাতা শহরটাই যে বৃন্দাবন, আর এই প্রাণপণ খাটুনিটুকুই যে বাঁশির তান, এ কথাটাকে ঠিক সুরে বলিতে পারি এমন কবিত্বশক্তি আমার নাই।

এ-সবের পাশে 'জ্যাঠামশায়' অংশে শ্রীবিলাসের লিখন বেশ ঋজু আর তীক্ষ্ণ। কখনও জগমোহনকে তার মনে হয়েছে যুদ্ধজাহাজের কাপ্তেনের মতো, কখনও সে বারবার ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে ফিরিয়ে এনেছে আগুনের প্রসঙ্গ।

নিজেকে ছাড়া শচীশ যাকে ভালোবেসেছে, সে একমাত্র জ্যাঠামশায়। শ্রীবিলাস তো বলেইছে : 'তিনি শচীশের বাপ ছিলেন, বন্ধু ছিলেন, আবার ছেলেও ছিলেন বলিতে পারা যায়।' জ্যাঠামশায়ের দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান সূত্র ছিল যুক্তিবাদ। যুক্তি দিয়ে যার ব্যাখ্যা মিলবে না, তাকে জীবনে গ্রহণ না-করাই ছিল জগমোহনের রীতি। যাঁর কাছে এই শিক্ষা পাওয়া যাবে, তাঁর জীবনবোধকে গ্রহণ করার সময়েও তো যুক্তি দিয়ে বিচার করে নিতে হবে। শচীশ কি পেরেছিল যুক্তিবাদের কষ্টিপাথরে জ্যাঠামশায়কে যাচাই করে নিতে? পজিটিভিস্টরা মানুষের দ্বিতীয় বিবাহে আস্থা পোষণ করতেন না। বিপত্নীক জ্যাঠামশায়ও ম্যালথস পড়েছিলেন বলে পুনর্বিবাহে আগ্রহ প্রকাশ করেননি। বিধবা ননিবালার বিবাহে কোন যুক্তিতে জগমোহন এত উৎসাহী হয়ে পড়লেন, সে কি কেবল অন্যের হিতসাধন? যিনি নিজেকে এতখানি নাস্তিক বলে মনে করেন, তিনি কোন যুক্তিতে হরিমোহন মামলা করার আগে পর্যন্ত দেবত্তোর সম্পত্তি স্বত্ত্ব ভোগ করছিলেন? জগমোহন পারেননি তত্ত্বের সঙ্গে জীবনকে মেলাতে। শচীশও কি পেরেছিল? লীলানন্দ স্বামীর রসের রাজ্যে ছিল মাটির সুঘ্রাণ। তিনি প্রত্যেক বছর একবার করে কোনও দুর্গম স্থানে, নির্জনে বেড়াতে যেতেন। সঙ্গে শিষ্যরাও স্বাগত। এ তো নিছক কোনও ধর্মগুরুর লক্ষণ নয়। গ্রন্থপাঠে তিন সহযাত্রী শিষ্যদের সামনে গান গেয়েছেন, আধুনিক কবির গান। পত্রিকাপাঠে, এমনকি ইংরিজি অনুবাদেও, এ-গান ছিল তাঁর নিজেরই লেখা।[১৮] কোন গানটি তিনি গেয়েছিলেন?

পথে যেতে তোমার সাথে
মিলন হল দিনের শেষে।
দেখতে গিয়ে, সাঁঝের আলো
মিলিয়ে গেল এক নিমেষে।

এ-গান লীলানন্দ স্বামীর সৃষ্টি নয়। এ-গান যে-আধুনিক কবি লিখেছিলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ। গানটি লেখা হয়েছিল ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে।[১৯] যুক্তির অতুলনীয় নৈপুণ্যে *চতুরঙ্গ* উপন্যাসের কাহিনির সময়কাল নির্ণয় করে তপোব্রত ঘোষ দেখিয়েছিলেন,

লীলানন্দ স্বামীর সঙ্গে শচীশ, দামিনী আর শ্রীবিলাসের দুর্গম তীর্থযাত্রা সম্ভব হয়ে উঠেছিল ১৯০১-এর মধ্য-জানুয়ারিতে।[২০] তখন তো এ-গানের স্বরলিপিও ছিল না। কীভাবে গানটি গেয়েছিলেন লীলানন্দ, স্বরচিত সুরে? নির্মম বিদ্রূপে যে দামিনী তাঁকে বারবার বিদ্ধ করেছে, গানটি শুনে তার চোখেও জল এসে গিয়েছিল। *সবুজ পত্র* পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও কেন এ-উপন্যাসে ব্যবহৃত হল সাধুভাষা, তা নিয়ে পণ্ডিত সমালোচকরা নানা তর্ক করেছেন। অভূতপূর্ব এক যুক্তিবলে সে-তর্ককে একলহমায় থামিয়ে দিয়েছিলেন তপোব্রত ঘোষ। তাঁর যুক্তি ছিল : 'যে-ডায়ারি ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দর গোড়াতেই শেষ হয়ে গিয়েছে তার ওপর ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দর চলিতভাষা-আন্দোলনের প্রভাব না পড়াই সম্ভব।'[২১] সেই একই যুক্তিতে আমরা বুঝতে পারি না, ১৯১৫-য় লেখা গান কীভাবে ১৯০১-এ লীলানন্দ স্বামীর পক্ষে গাওয়া সম্ভব। দামিনী শচীশকে বলেছিল, 'আমি তোমার গুরুর কাছ হইতে কিছুই পাই নাই।' শচীশও কি কিছু পেয়েছিল? সে স্থির থাকতে পারেনি লীলানন্দ স্বামীর দলে। এ-নিয়ে কানাকানি আর গালাগালি চলেছিল খবরের কাগজে। ভারি চমৎকার কথা লিখেছিল শ্রীবিলাস :

> একদিন অতি উচ্চৈঃস্বরে সে না মানিত জাত, না মানিত ধর্ম; তার পরে আর-একদিন অতি উচ্চৈঃস্বরে সে খাওয়া-ছোঁয়া স্নান-তর্পণ যোগযাগ দেবদেবী কিছুই মানিতে বাকি রাখিল না; তার পরে আর-একদিন এই-সমস্তই মানিয়া-লওয়ার ঝুরি ঝুরি বোঝা ফেলিয়া দিয়া সে নীরবে শান্ত হইয়া বসিল—কী মানিল আর কী না মানিল তাহা বোঝা গেল না।

শুধু জ্যাঠামশায়ের নাস্তিকধর্ম বা লীলানন্দ স্বামীর রসধর্ম নয়, স্বধর্মে স্থিত হতে গেলেও শচীশের চাই তত্ত্বের আশ্রয়। রূপকে আর অরূপকে নিয়ে সহজে তার সংশয় ঘোচে না। এ-সব কিছুকে ত্যাগ করে সে বলতে পারে : 'অসীম, তুমি আমার, তুমি আমার।' এখানে শচীশকে আমাদের রাবীন্দ্রিক মনে হওয়ার কথা নয়। ১৯১০-এর ৪ জুলাই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন এ-গান : 'সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর / আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।' শচীশ একেবারে উলটো কথাই বলেছে। সে জীবনপলাতক। সে সমস্ত কিছুর থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায়। ইতিমধ্যে শচীশের সাধনতত্ত্বের 'বানিয়ে-তোলা কৃত্রিমতা' অনুপুঙ্খ সূক্ষ্মতায় অনাবৃত হয়ে পড়েছে সমালোচকের চোখে।[২২] পত্রিকাপাঠে শ্রীবিলাস স্পষ্ট ভাষায় লিখেছিল :

> এইখানে শচীশের সঙ্গে আমার তফাৎ। আমি ননীবালাকে ননীবালা এবং দামিনীকে দামিনী বলিয়াই জানি। তাহাদিগকে যদি বিশ্বপ্রকৃতির নারীরূপ বলিয়াই দেখি তবে তাদের একজন অসাধুতার দায় বহন করিয়া কেমন করিয়া মরিল এবং আর-একজন সাধুতার চাপে কেমন করিয়া মরিতেছে তাহা সত্য করিয়া বুঝিতে পারিতাম না।[২৩]

শ্রীবিলাসের লিখনে একাধিকবার উদ্ধৃত হয়েছে শচীশের ডায়ারির অংশবিশেষ। *চতুরঙ্গ* উপন্যাসটি যে আসলে শ্রীবিলাসের ডায়ারি, এও এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য।[২৪] একই সময়ের, একই ঘটনার উপস্থাপন দু-জনের ডায়ারিতেই পাওয়া যাবে। শচীশের সঙ্গে শ্রীবিলাসের

জীবনবোধের তফাৎ তাদের দু-জনের ডায়ারির মধ্যে দূরত্ব রচনা করেছে। শচীশ বহুরূপে শুধু নিজেকে দেখেছে। বলা ভালো, সে শুধু নিজেই নিজেকে দেখেছে, অন্যের চোখে নিজেকে দেখার দগ্ধ বাসনা তার নেই। অন্যকে তন্ময়ভাবে উপলব্ধি করতে পারার মতো মন তার গড়ে ওঠেনি। দামিনী-শ্রীবিলাসকে না-হয় সে পুরোটা উপলব্ধি করতে পারেনি, জ্যাঠামশায়কেও কি পেরেছিল? শ্রীবিলাস শুধু নিজেকে দেখেনি, নিজের কলমে অন্যদেরও মূর্ত করে তুলেছে। তার লিখন যেমন স্বচ্ছ সাবলীল কৌতুকপূর্ণ, তেমনি তার অন্তর্দৃষ্টিও তুলনাহীন। বিশ্বকে সে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে দেখেনি, চারপাশের মানুষগুলিকেও সে নিরাসক্ত তদগত দৃষ্টিতে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে নিজের ডায়ারিতে। শচীশ শেষ পর্যন্ত 'জ্যাঠামশায়ের চেলা' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি নিজেকে। লীলানন্দ স্বামীর শিষ্যত্বও সে রক্ষা করতে পারেনি। জ্যাঠামশায়ের হিতবাদ আর লীলানন্দের রসবাদকে নিজের মধ্যে রক্ষা করেও সংসারধর্মে শ্রীবিলাস হয়ে উঠেছিল হংসপ্রতিম। জীবনে দুধ আর জলকে সে আলাদা করতে পেরেছে। তত্ত্বকে মেলাতে পেরেছে জীবনের সঙ্গে। দামিনীর সঙ্গে প্রথাবিরুদ্ধ স্বল্পস্থায়ী দাম্পত্যযাপন করে সে বলতে পেরেছে : 'দিনগুলি যে গেল সে হাঁটিয়াও নয়, ছুটিয়াও নয়, একেবারে নাচিয়া চলে গেল।' শুরুতেই শ্রীবিলাস দামিনী সম্পর্কে বলেছিল, 'সে নারী মৃত্যুর কেউ নয়, সে জীবনরসের রসিক।' আর মৃত্যুর আগে দামিনী শ্রীবিলাসকে বলেছে, 'সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।' দামিনীর মৃত্যুর পর শ্রীবিলাস কোনও 'পিসি বা মাসির অনুরোধ শিরোধার্য' করে দ্বিতীয় বিয়ে করেনি। তার এই পুনর্বিবাহ না-করার নেপথ্যে ম্যালথস পড়ার কোনও ভূমিকা নেই। জ্যাঠামশায় নারীকে এতটা দূরে সরিয়ে রাখতেন যে, তিনি শুধু নির্বিশেষ বিশ্বরূপিণীকেই দেখতেন, কোনও বিশেষ নারী তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারত না। শচীশও ননিবালাকে আর দামিনীকে বিশ্বপ্রকৃতির নারীরূপ বলে কল্পনা করে স্বস্তি পেয়েছিল। শচীশ যেখানে জ্যাঠামশায়ের সীমাবদ্ধতায় আটকে পড়েছে, সেখানে শ্রীবিলাস তাকে অতিক্রম করে গেছে আশ্চর্য আত্মদীক্ষায়। দামিনী শ্রীবিলাসের কাছে 'পদ্মের পাতায় শিশিরের ফোঁটা নয়।' শ্রীবিলাস লিখেছে : 'আমি যাকে কাছে পাইলাম সে গৃহিণী হইল না, সে মায়া হইল না, সে সত্য রহিল, সে শেষ পর্যন্ত দামিনী। কার সাধ্য তাকে ছায়া বলে?' শচীশ শুধু দামিনীর শোভাটুকু দেখেছে, আর শ্রীবিলাস দামিনীকেই সত্য বলে জেনেছে। এ-উপন্যাসে শ্রীবিলাসই সেই আশ্চর্য চালিকাশক্তি, যে নিজের জীবনে যুক্তিবাদী জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পেরেছে রসবাদী লীলানন্দ স্বামীকে, জীবনপলাতক শচীশের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করতে পেরেছে জীবনরসিক দামিনীর। শ্রীবিলাস শেষ পর্যন্ত নাস্তিক জ্যাঠামশায়ের দীক্ষাকে আত্মস্থ করতে পেরেছিল, তাই সে দামিনীর সঙ্গে নিজের বিয়ের আয়োজন করেছিল চৈত্র মাসে। শ্রীবিলাস শেষ পর্যন্ত লীলানন্দ স্বামীর জীবনবোধকে অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত করতে পেরেছে। সীমার মধ্যেই অসীমকে দেখার দৃষ্টি লীলানন্দ স্বামীর আয়ত্তে ছিল না। স্বধর্মের মাধুর্যে শ্রীবিলাস তাকে অর্জন করেছিল। তাই কলকাতা শহরটি তার কাছে হয়ে উঠেছিল বৃন্দাবন। মৃত্যুর সঙ্গে মিল রেখে কীভাবে বাঁচতে হয়, তার সন্ধান সে

জীবন দিয়ে পেয়েছিল। শচীশের অনুবর্তী হওয়ার মোহ থেকে নিঃশেষে মুক্ত হয়ে স্বধর্মে স্বাধীন হয়েছিল সে। এ-উপন্যাস তাই শচীশের নয়, একান্তই শ্রীবিলাসের আখ্যান।

ঋণ

অধ্যাপক তপোব্রত ঘোষ

অধ্যাপক অভ্র বসু

আকর

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত সংস্করণ, জুলাই ১৯৮৬।

খ. প্রমথ চৌধুরি সম্পাদিত, *সবুজ পত্র*, প্রথম বর্ষ, অষ্টম-নবম-দশম-একাদশ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ-পৌষ-মাঘ-ফাল্গুন ১৩২১ বঙ্গাব্দ।

গ. রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে রক্ষিত পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ১৫০ (১) এবং ১৫০ (২)।

ঘ. Rabindranath Tagore, *Broken Ties and Other Stories,* Macmillan and Co. Limited, London, 1925.

নির্দেশিকা

১. Bimanbehari Mazumdar, *Heroines of Tagore,* Firma KLM, 1968, p. 238.

২. Ibid.

৩. Ibid, p. 237.

৪. রাধাগোবিন্দ কর, *প্লেগ*, সুবীরকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, সূত্রধর, ২০১১, দ্র. *প্রসঙ্গকথা*, পৃ. ৫-১৬।

৫. তপোব্রত ঘোষ, *শ্রীবিলাসের ডায়ারি*, ভারবি, ২০১৪, পৃ. ৩৮-৪২।

৬. তদেব, পৃ. ৪২।

৭. দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে বেলা দত্তগুপ্তের *বঙ্গে ধ্রুববাদ* বইটির পরিশিষ্টে। দ্র. বেল দত্তগুপ্ত, *বঙ্গে ধ্রুববাদ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি*, ২০০৯।

৮. এ-প্রসঙ্গে যে-বইগুলি দেখা যেতে পারে : ক) Edited by J. O. Urmson, *The Concise Encyclopedia of Western Philosophy and Philosophers,* London, 1975। খ) L. Kolakowski, *Positivist Philosophy*, London, 1972।

৯. বাংলা ভাষায় প্রথম এই সত্য প্রকাশ করেছিলেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার ১২৮১ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত 'কোমতদর্শন' প্রবন্ধে লিখেছিলেন : 'কোমত কেবল দার্শনিক নহেন, তিনি একজন নূতন ধর্মশাস্ত্র প্রবর্তক। প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে বেলা দত্তগুপ্তের *বঙ্গে ধ্রুববাদ* বইটির পরিশিষ্টে। দ্র. বেলা দত্তগুপ্ত, *বঙ্গে ধ্রুববাদ*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৯।

১০. Geraldine Hancock Forbes, *Positivism in Bengal,* Papyrus, 1999, pp. 44-62।

১১. Ibid, p. 46।

১২. বেলা দত্তগুপ্ত, ২০০৯, পৃ. ১৩।
১৩. তপোব্রত ঘোষ, ২০১৪, পৃ. ৪৬।
১৪. তদেব, পৃ. ৫০-৫১।
১৫. তদেব, পৃ. ৮৭।
১৬. প্রমথ চৌধুরি সম্পাদিত, *সবুজ পত্র*, পৌষ ১৩২১, পৃ. ৬২৪।
১৭. পাণ্ডুলিপি সংখ্যা ১৫০ (২), প্রতিলিপি সংখ্যা ১৯।
১৮. উপন্যাসের প্রয়োজনেই গানটি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। চরণবিন্যাসের ঈষৎ পরিবর্তন ছাড়া এ-গানের বিশেষ পাঠভেদ লক্ষ করা যাবে না। এর স্বতন্ত্র কোনও পাণ্ডুলিপিও নেই।
১৯. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী*, অভ্র বসু সম্পাদিত, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ২০১২, পৃ. ১৬৪।
২০. তপোব্রত ঘোষ, ২০১৪, পৃ. ৩১।
২১. তদেব, পৃ. ৪২।
২২. শতবর্ষ অতিক্রম করার পরেও *চতুরঙ্গ* উপন্যাসটিকে শচীশের দৃষ্টিকোণ থেকে পড়ার প্রচলন রয়েই গেছে। এই ধারায় একমাত্র উজ্জ্বল ব্যতিক্রম তপোব্রত ঘোষের *শ্রীবিলাসের ডায়ারি* বইটি।
২৩. প্রমথ চৌধুরি সম্পাদিত, *সবুজ পত্র*, পৌষ ১৩২১, পৃ. ১৩২১, পৃ. ৬৩১। পত্রিকা পাঠে সর্বত্র 'ননীবালা' বানানটিই ব্যবহৃত হয়েছিল।
২৪. উপন্যাসটিকে দেখার এই অভিমুখ যুক্তিগ্রাহ্যভাবে প্রথম উপস্থাপিত হয়েছিল তপোব্রত ঘোষের *শ্রীবিলাসের ডায়ারি* বইটিতে। রবীন্দ্র-সমালোচনায় ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত সেই যুক্তিগুলি কোথাও খণ্ডিত হয়নি। তাই একেই প্রতিষ্ঠিত সত্য বলে আমরা স্বীকার করে নিয়েছি।